জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও সর্বজনীন নাগরিক পেনশন

ভূমিকা

সমাজের অতি দরিদ্র অংশের সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র' সম্প্রতি মন্ত্রীপরিষদে অনুমোদিত হয়েছে। ১৯৯০ এর পর থেকে শুরু হওয়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ধীরে ধীরে সমাজের অতি দরিদ্রদের অন্তর্ভূক্তি এবং ক্রমাগত এখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। সরকারি হিসেবে এ বরাদ্দ জিডিপির ২.০২ শতাংশ এবং সরকারি ব্যয়ের প্রায় ১২ শতাংশ। সর্বশেষ সরকারি হিসেব মতে দেশে সাধারণ দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার ২০১৪ সালে যথাক্রমে ২৪.৮% এবং ১০% এর কোঠায় নেমে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা চূড়ান্ত হয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাই একই কারণে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা একেবারে অপ্রত্যাশিতও নয়। তবে নীতিমালা চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ হলেও সুদূরপরাহত মনে করার কোন কারণ নেই। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানের দিকনির্দেশনা অবশ্য এখানো অস্পষ্ট। আশাকরি রাতারাতি নীতিমালা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব না হলেও 'মধ্যম আয়ের দেশে' উন্নীত হবার লক্ষভিমুখি একটি দেশ ও সাংবিধানিকভাবে "কল্যাণমূলক রাষ্ট্র" এর অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে (সংবিধান অনুচ্ছেদ-১৫) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন একটি অপরিহার্য বিষয় হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। এসব বিষয় মনে রেখে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র বা সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা বিষয়ে কিছু সুপারিশ পেশ করাই এ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা বা সেফটি নেট কাযক্রমের উপর ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও র্বতমান আলোচনায় সে দিকে বিস্তারিত আলোকপাত না করে শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট বর্ণনার খাতিরে সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় তুলে ধরা হবে রচনার প্রথম পর্বে। তবে মূল আলোচনাটি নিবেদিত হবে দ্বিতীয় পর্বে 'সর্বজনীন নাগরিক পেনশন' ব্যবস্থা প্রচলনের নানা কারণ ও যৌক্তিকতাকে সামনে রেখে। সম্প্রতি গ্রহীত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে জীবনচক্রভিত্তিক সামজিক নিরাপত্তা ও পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা বিশেষ স্তান পেয়েছে। কিন্তু সে আলোচনাকে পুর্ণাঙ্গতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। জাতীয় নাগরিক পেনশনের একটি রোডম্যাপ এ কৌশলপত্রে যেভাবে আসতে পারত তা সেভাবে আসেনি। তবে এ কৌশলপত্রে জাতীয় নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা প্রণয়নের পথে ব্যবহারযোগ্য অনেক তথ্য উপাত্তের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বর্তমান রচনার মূল প্রতিপাদ্য হবে অতি দরিদ্রদের সুরক্ষার জন্য চলতি কার্যক্রমের সাথে সরকারি চাকুরিজীবিদের পাশাপার্শি দেশের সকল নাগরিকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বয়সের পর জাতীয় নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার সূত্রপাত করা।

এক

প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে

প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ এক ধরনের গতানুগতিকতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এটি বর্তমানে সৃজনশীলতা রহিত এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের বেড়াজালে আটকে পড়া একটি কর্মসূচিতে রুপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন না করে এ কার্যক্রমকে গতানুগতিক পদ্ধতিতে টেনে নেয়া অনেকটা অপচয়ী ও অর্থহীন। এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ১৯৯০ এর পর নতুন পদ্ধতিতে গতি পেলেও দুর্যোগকালীন সহায়তা, ত্রাণ ও খাদ্য নিরাপত্তার অংশ হিসাবে সামাজিক সুরক্ষার ইতিহাস এদেশে নতুন নয়। তবে টেকসই দারিদ্র্য নিরসন ও তৃণমূলে উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এ কার্যক্রমের যে নবযাত্রা তা এখনও শক্তিশালী স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠনিক রূপ ও কাঠামো লাভ করতে পারেনি। বর্তমানে ২৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে প্রায় ১৪৫টি কাযক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসাবে চিহ্নিত করে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতের বরাদ্দ ৩০,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে এবং বলা হয় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ৩২ শতাংশ এ কার্যক্রমের সুফল ভোগ করবে। সরকারি ও বেসরকারি নানা মূল্যায়নে ইতোমধ্যে অনেক এুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত হয়েছে। ইতোপূর্বে ৩০টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির একটি মূল্যায়নে দেখা গেছে, মোট উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির ২৪.৫% কে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে সে সময়ে দাবী করা হলেও অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি বা খানার ১৮% অন্তর্ভুক্তির যোগ্যই ছিল না।[১] নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে তাদের অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে সরকারি রাজস্ব থেকে অর্থায়িত সরকারি চাকুরীজীবীদের পেনশনসহ পাঁচটি জীবনচক্র ভিত্তিক নগদ অর্থ হস্তান্তর কার্যক্রমের ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে ৩৫.৭ মিলিয়ন উপকার ভোগীর পেছনে মোট প্রাক্কলিত বরাদ্দ হবে ৩৪৫ বিলিয়ন টাকা। যাব মধ্য থেকে সরাসরি উপকারভোগীর কাছে বন্টিত হবে ২১২ বিলিয়ন, বাকী ১৩৩ বিলিয়ন হবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রশাসনিক ব্যয়।[২] এত উচ্চ প্রশাসনিক ব্যয় যে কোন মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া খাদ্যশস্য ভিত্তিক তৃণমূলে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমূহের দুর্নীতি, অপচয়, রাজনৈতিক অপব্যবহার এবং এ কর্মযজ্ঞের নৈরাজ্যকর বিপুল বিস্তৃতি এর গুণমান রক্ষা এবং সঠিক ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায়। তাই এ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বিরাজিত দুষ্ট চক্রের তিনটি প্রধান উপাদান বা দিক থেকে মুক্ত করার কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে। **এক.** অবৈধ ও অন্যায় ভিত্তিক রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা, **দুই.** অতিমাত্রায় এাণমুখিতা পরিহার এবং তিন. দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতি সরকারি প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদয় উদাসীনতার অবসান করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সত্যিকার অর্থে প্রচলিত দারিদ্র নিরসনমুখি ও অতি-দরিদ্রদের জন্য নিবেদিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যাসের যেকোন উদ্যোগে নিম্নের কয়েকটি সুপারিশ ভেবে দেখা যেতে পারে।

(১) বর্তমানে তেইশটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ১৪৫টি কার্যক্রমকে গুটিয়ে একটি লীড মন্ত্রণালয় এবং সর্বাধিক ছয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে লীড মন্ত্রণালয় হতে পারে অর্থ, পরিকল্পনা এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ এর মধ্যে যে কোনো একটি বা তিনটি মন্ত্রনালয়ের যৌথ একটি কমিটি এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হতে পারে স্থানীয় সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু, শিক্ষা (এক্ষেত্রে দুটি মন্ত্রণালয়) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ।

(২) কার্যক্রমগুলোকে সংখ্যায় না বাড়িয়ে প্রধান কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত করে এক একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়ন করা এবং প্রধান গুচ্ছসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে।

ক. দুর্যোগকালীন জরুরি এাণ (স্থানীয় সরকার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)

খ. অতিদরিদ্র, অক্ষম ও ছিন্নমূলদের ত্রাণ ও টেকসই উন্নয়ন সহায়তা (স্থানীয় সরকার, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু)

গ. সামাজিক উন্নয়নভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সুরক্ষায় সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম (স্থানীয় সরকার এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য)

ঘ. গৃহায়ন ও আবাসন সহায়তা (স্থানীয় সরকার-স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ও গৃহায়ণ)

ঙ. আয়কর ও জাতীয় পেনশন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে সর্বজনীন নাগরিক পেনশন (অর্থ-এনবিআর, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সরকার)।

প্রথম গুচ্ছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য দুর্ঘটনার শিকার মানুষ বা অঞ্চল বিশেষের জন্য জরুরি এাণ তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয় গুচ্ছে অতিদরিদ্র, অক্ষম, প্রতিবন্ধি, বেকার ও কর্মহীনদের জন্য প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ পরিচালিত হতে পারে। তৃতীয় গুচ্ছে সমগ্র সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সর্বাধিক ব্যয় ও সর্বাধিক সংখ্যক মানূষ অন্তর্ভূক্ত হবে। এখানে দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা ও তার সকল আনুসঙ্গিক ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক, দুপুরের খাবার ও সকল শিক্ষা উপকরণ এ বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হবে। এ গুচ্ছের অন্যতম আর একটি প্রধান উপাদান হবে স্বাস্থ্য সেবা। দেশের সকল নাগরিক (আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা) নিজ নিজ এলাকায় চিকিৎসকের নিশ্চিত সেবা নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত হবে। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সবার জন্য রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল থেকে অর্থায়ন করবে। চতুর্থ গুচ্ছে রাষ্ট্রীয় বা বেসরকারিভাবে গৃহায়ন পরিকল্পনা, গৃহনির্মাণ ঋণ, স্বল্প ভাড়ায় সরকারি আবাসন এবং ছিন্নমূলদের জন্য সেল্টার হোম এর বন্দোবস্ত থাকবে। সর্বশেষ গুচ্ছে দেশের সকল সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর পেনশনের নিশ্চয়তা থাকবে।

দারিদ্রের তুলনামূলক তীব্রতামুক্ত একটি মধ্যম বা উচ্চ আয়ের দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সাধারণত: উপরে উল্লেখিত কাঠামোতেই হয়ে থাকে। একটি মধ্যম আয়মুখি দেশের কাতারে উপনীত হবার এ সন্ধিক্ষণে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চিন্তাকে তাই নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রথম চারটি গুচ্ছের উপর অনেক আলাপ-আলোচনা থাকলেও পঞ্চম বা শেষ গুচ্ছের বিষয়টির উপর এখনো ফলপ্রসু কোন আলোচনা হয়নি। তাই আমাদের পরবর্তী আলোচনায় পাঁচটির মধ্যে সর্বশেষ বা পঞ্চম গুচ্ছের "সর্বজনীন নাগরিক পেনশন'র রূপ-কাঠামো, অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

দুই

সর্বজনীন নাগরিক পেনশন বা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য রাষ্ট্রীয় পেনশন

সত্যিকার অর্থে পেনশন ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তা এদেশে শুধুমাত্র সামরিক বেসামারিক সরকারি চাকুরেদের বেলায় প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত। সাম্প্রতিককালে পেনশন ব্যবস্থা সরকারি চাকুরিজীবিদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার চাকুরেদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে ষাট উর্ধ্ব বয়সী বা ২৫ বছরের সরকারি চাকুরির পর সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের সাথে তুল্য বা প্রযোজ্য হারে সরকারি চাকুরিজীবীগণ পেনশন পেয়ে থাকেন এবং তা তারা এককালীন বা মাসে মাসে বেতনের মত পেতে পারেন। মূল চাকুরিজীবীর মৃত্যুর পর স্বামী/স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে এ পেনশন পেতে পারেন। সরকারি চাকুরির বাইরে করপোরেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচ্যুইটি স্কীম রয়েছে। সেভাবে তারা চাকুরিগত কারনে চাকুরি পরবর্তী সময়ে এ সুবিধা ভোগ করে থাকেন।[৩]

দেশে সরকারি-বেসরকারি পেনশন বা কর্মোত্তর আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত অতিভাগ্যবানগণ ছাড়াও বয়স্কদের একটি বড় অংশ রয়েছেন যারা তাদের কর্মজীবনে দেশ ও সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন, কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে নিরাপদ, নিশ্চিত ও নিরুদ্বেগ একটি জীবন যাপন করতে পারেন না। তারমধ্যে একটি অংশ এমনও আছেন যারা কর্মক্ষম থাকার সময় নিয়মিতভাবে সরকারের তহবিলে আয়করসহ নানা কর-রাজস্ব পরিশোধ করে গেছেন। হয়ত কর্মজীবনে টানা ১০-৩০ বছর এভাবে রাজস্ব বা আয়কর দিয়েছেন। আবার অনেকে আদৌ হয়তো কর আয় সীমার মধ্যে পড়েননি, কিন্তু দেশের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া বা হারানোর পর অর্থাভাবে দুঃসহ জীবন যাপন করেন। এখন বাংলাদেশের গড় আয়ু ৭০ বছর অতিক্রম করেছে। ষাট বছর বয়স হবার পর সঞ্চিত অর্থসম্পদ পর্যাপ্ত না থাকলে প্রায় সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অন্যের অনুগ্রহ ও কৃপায় জীবন যাপন করতে হয়। অথবা অনেকে যাতে অন্যের গলগ্রহ হতে না হয় সেজন্য কর্মক্ষম থাকার সময় সিদ্ধ-অসিদ্ধ নানা উপায়ে ঐ সময়ের জন্য সঞ্চয় করেন। রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট বয়স, স্বাস্থ্য, কর্মাবস্থা বিবেচনা করে সকল বয়স্কদের জন্য একটি পেনশন ব্যবস্থায় যেতে পারে। এ ব্যবস্থাটির একটি সর্বজনীন রূপ ও কাঠামো নির্মাণ করা যায়। আবার ভিন্নভাবে বীমা ব্যবস্থা এবং বীমা ও পেনশন উভয় ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি নতুন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

সর্বজনীন কাঠামো: আয়কর ব্যবস্থার সাথে পেনশন ব্যবস্থার সংযোগ সাধনের মাধ্যমে একটি পেনশন কাঠামো গড়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের সামরিক-বেসামরিক, সরকারি- বেসরকারি, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক, স্বাধীন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, যেকোন কর্মে নিয়োজিত সকল কর্মজীবি-পেশাজীবি-শ্রমজীবি সবার একটি সোস্যাল সিকিউরিটি নিবন্ধন থাকবে। যা বর্তমানে প্রচলিত আমাদের জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথেও যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ জাতীয় পরিচয় পত্রের সূত্রে সবার একটি আয়কর নিবন্ধনও থাকবে। আয়কর প্রদানকারীগণের নাগরিক পেনশনের ইটিই হবে সাধারণ এবং নূন্যতম মৌল সূত্র। প্রতিজন আয়কর প্রদানকারীর আয়করের অংক ও হারের বিপরীতে বিভিন্ন স্লাবের বর্ধিত অংক তাদের মূল পেনশন কনট্রিভিউশন হিসাবে সাথে যুক্তহবে। এভাবে পেনশন ও আয়করের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। অর্থাৎ সকল বয়স্ক নাগরিক একটি সাধারণ অংকের (ধরা যাক ৬০/৬২ বছর বয়সের পর প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা) পেনশন প্রাপ্য হতে পারেন, কিন্তু আয়কর প্রদানের তারতম্যের উপর পেনশনের বর্ধিত অংক নির্ধারিত হতে পারে যা সরকার নির্ধারিত মৌল অংকের সাথে বাড়তি হিসাবে যুক্ত হবে।

বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশনের মৌল অংক এক টাকার বিনিময়ে ২৩০ টাকা সর্বজনীন হলেও চাকুরির শেষ বেতন অংক প্রত্যেকের প্রাপ্য পেনশনের ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টি করে। নতুন ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারি বাদে অন্যদের জন্য বেতন নয়, আয়কর প্রদানের তারতম্য অবসরকারীন পেনশনের মোট অংকে তারতম্য সৃষ্টি করবে। অথবা বিমা স্কীমের কিস্তির পরিমান পেনশন বা অবসর ভাতার উপর প্রভাব ফেলবে।

দেশে ডাক্তার, পরামর্শক, আনইজীবিসহ সকল স্বাধীন পেশার ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন সংস্থার বিপুল সংখ্যক এনজিও কর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বেসরকারি-বাণিজ্য-সেবা খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্বনিয়োজিতদের অনেকেই আয়কর দেন। আবার স্বনিয়োজিত বা বেতনভূক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনেকে আয়কর দেন না, অনেকে আবার দিলেও তা যথাযথভাবে দেন না। সত্যিকারভাবে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে যার আয়কর সঠিকভাবে দেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ যারা আযকর দেন না তাদের কোন শাস্তির ভয় নেই। যারা দেন তাদের জন্য অনেক কঠোর নিয়ম-কানুন, কিন্তু বিশেষ কোন স্বীকৃতি বা সুবিধা নেই। অনেক আছেন যাদের বেতন থেকে বা উৎস থেকে আয়কর কর্তন হয়। তারা সে করের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। নিজের বা পরিবারের চিকিৎসা, সন্তানের শেখাপড়া কিংবা অন্যান্য যে কোন পাবলিক ইউটিলিটি বা রাষ্ট্রীয় কোন বিশেষ স্বীকৃতি কিছুই তাদের জন্য থাকেনা। আবার কর্মক্ষমতা হারানোর পর সামাজিক নিরাপত্তার কোন স্কীমেও তাদের কোন দাবী থাকে না। সন্তানসন্ততির অনুগ্রহ বা যদি সম্ভব হয় তা'হলে জমানো অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভর করে থাকেন। তাই হয়ত ঐ

টেনশন থেকেই বৈধ-অবৈধ নানাভাবে সম্পদ গড়ার একটা প্রবণতা সমাজে তীব্রভাবে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বয়সে তাদের অবদান যথা আয়কর ও অন্যান্য সকল কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বজনীন একটি মৌলিক পেনশনের ব্যবস্থা থাকলে কর্ম জীবনে আয়কর প্রদানে একটি স্বতঃস্ফূর্ততা থাকত, তেমনিভাবে সকলের জন্য তা দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনামুক্ত জীবনযাপনের সহায়ক হতো। তাই সরকারি-বেসরকারি চাকুরী নয়, আয়কর ব্যবস্থার সাথে পেনশন সুবিধার একটি সংযোগ সাধন করে নতুন একটি সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। পশ্চিমা বিশ্বে অনুরূপ একটি ব্যবস্থা প্রায় শতাব্দী কালব্যাপী বিভিন্ন রকম আবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। মধ্যম আয়মূখী দেশ ও সাংবিধানিকভাবে কল্যাণমূলক হিসেবে বাংলাদেশ এ যাবতকাল অনুসরণকৃত পশ্চিমের 'সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা' খতিয়ে দেখতে পারে।

পেনশন ব্যবস্থার অর্থায়নঃ প্রতিবছরের আহরিত কর বা আয়কর রাজস্বের একটি সুনির্দিষ্ট হার রাষ্ট্রীয় পেনশন তহবিলে জমা হতে পারে। রাষ্ট্র বিভিন্ন অর্থকরী প্রকল্পে এ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। এতে রাষ্ট্রীয় খাতে বিনিয়োগযোগ্য একটি বৃহৎ তহবিল গঠিত হবে। দেশে আয়কর প্রদানকারী নাগরিকের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাবে। একদিকে সামাজিক অস্থিরতা ও কর্মকালীন উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা কমবে, অপরদিক একটি মানবিক ও আত্মমর্যাদাশীল সমাজ গড়ে উঠবে। দেশের শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশকারী প্রতিটি নাগরিক কর্ম নেটওয়ার্কের আওতায় আসার সাথে সাথে পেনশন নেটওয়ার্কেরও আওতাভুক্ত হবে। এভাবে বিষয়টি সংগঠিত হলে রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে আয়কর পাবে কমপক্ষে চল্লিশ বছর, আর পেনশন দিতে হবে সর্বাধিক ১০ থেকে ২০ বছর।

কর্মকালীন বা ব্যক্তিগত পেনশন/বীমা নাগরিকদের জন্য স্বেচ্ছায় পেনশনের আওতায় আনার জন্য রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির মাধ্যমে 'জাতীয় পেনশন বীমা'ও চালু হতে পারে। স্ব-কর্মে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি কর্মকালীন সময়ে এ বীমার আওতায় এসে ষাট উর্ধ্ব বয়সে নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম অনুযায়ী পেনশন পেতে পারেন। এ পেনশনে স্বামী/স্ত্রী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তবে তা আয়করের সাথে পেনশনকে যুক্ত করার বিকল্প নয়।

বর্তমানে সরকারি ব্যয় কাঠামোর সর্বাধিক ব্যয় হয় সামরিক-বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা, পেনশন ও আনুতোষিক খাতে। দেশে সামরিক বেসামরিক মিলিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ২১ লাখের নীচে। ২০১৫-১৬ সালের বাজেট বিবরণী ৪ (সংযুক্ত তহবিল অনুন্নয়ন ব্যয়) এবং বিবরণী ৬ (অনুন্নয়ন ব্যয়-মন্ত্রণালয় ও বিভাগওয়ারী) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যয় বরাদ্দ ৪৫,৩৫৬ কোটি ৯২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। এখানে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের পেনশন ও আনুতোষিকের ১১,৫৮৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার বরাদ্দকে যুক্ত করলে তা দাঁড়ায় ৫৬,৯৪০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায়। সামরিক খাতের দৃশ্যমান বরাদ্দ ১৭,৯৬১ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যেও সিংহভাগ বেতন, ভাতা, পেনশন ও আনুতোষিক ব্যয়। বলা হয়ে থাকে ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে ৩০ বা ৩১ লাখ মানুষের কর নিবন্ধন (TIN) রয়েছে। তারমধ্যে ১১ লাখের মত ব্যক্তি সত্যিকারের কর প্রদান করে থাকে। এতদিন সরকারি কর্মচারীগণ বেতনের উপর কর দিতেন না, বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়েছে। তারাও কয়েক বছর ধরে বেতনের উপর কর দিচ্ছেন। মন্ত্রী, এম.পি.গণের বেতন, ভাতা কোন একটি বিশেষ যুক্তিতে করমুক্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চলতি বছরে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয় ও মুনাফার উপর ৬৪,৯৭১ কোটি টাকা কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তার অতিরিক্ত, মূল্য সংযোজন কর আদায়ের লক্ষমাত্রা ৬৪,২৬২ কোটি ৯১ লাখ টাকা। প্রথম করটি ব্যক্তি ও করপোরেট সেক্টর থেকে সরাসরি আদায় হবে এবং দ্বিতীয় করটি সারাদেশের ধনী-গরীব সবাই দেবে। সবমিলিয়ে রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর এবং কর ব্যতিত অন্যান্য প্রাপ্তি মিলিয়ে সরকার ২,০৮,৪৪৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা প্রাপ্তির আশা করে, যার মধ্য থেকে নির্ঘাত ৭৪.৯০২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা সামরিক-বেসামরিক সরকারি চাকুরেদের জন্য ব্যয়িত হবে। সরকারের ব্যয় কাঠামোর এ অংশটি পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত নয়। দেশের সরকার ও সরকারি কর্মচারীদের পরিপোষণের জন্যই সাধারণ

মানুষ কর দেয় না। এ করের কারনে যে সেবা, সহায়তা ও সরবরাহ নাগরিকগণের প্রাপ্য সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসলে এ ব্যয় কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে পেনশন ব্যবস্থা পুনর্গঠনে সরকারি চাকুরিই শুধু অগ্রগণ্য বিষয় হিসাবে থাকতে হবে তা নয়, সরকার ও রাষ্ট্রের নাগরিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে কর প্রদানকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। তাই সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা চালুর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সকল কর প্রদানকারীদের পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা করতে হবে। অন্যান্য সেফটিনেট বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে পুনর্বিন্যাস করে ধীরে ধীরে নাগরিক পেনশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। মধ্যম আয়মুখি দেশ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে এর কোন বিকল্প নেই। বর্তমান ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের প্রদত্ত অর্থের অন্তত ৫% শতাংশ পেনশন তহবিলে স্থানান্তর বর্তমান বা আগামী অর্থ বছর থেকে শুরু করা যায় এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে অন্তত বিগত দশ বছর ধরে নিয়মিত কর প্রদানকারী ষাট উর্ধ্ব বয়সীদের জন্য পেনশন শুরু করা সম্ভব। দেশে ষাট উধর্ব বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮-১২% বা সর্বোচ্চ ১ কোটি ২০ লাখ যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত এ অবস্থার মধ্যেই থাকবে বলে আশা করা যায়।

একই সাথে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা নীতির আলোকে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বীমা ব্যবস্থার একটি কাঠামো গঠন করে আয়কর, বীমা প্রিমিয়াম ও জাতীয় নাগরিক পেনশনকে একটি একক কর্মসূচি হিসাবে ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করার একটি পথরেখা (Road Map) তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করা উচিত। এ লক্ষ্যে সরকারকে স্বচ্ছ ও বাস্তবায়নযোগ্য একটি রূপরেখা প্রণয়ন ও তা স্বাধীনভাবে মনিটরিং এ সহায়তার জন্য একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন আবশ্যক। বরঞ্চ স্থায়ী বেতন কমিশন ও স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশন কমিশন একীভূত একটি ব্যবস্থায়ও পুনর্গঠিত হতে পারে।

অতিদরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্ত কার্যক্রমের বিকল্প অর্থায়ন

বর্তমানে নগদ অর্থ ও খাদ্যশস্যের বিনিময়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রায় ৩৭০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার উল্লেখিত অন্যান্য কার্যক্রম বিশেষত: নাগরিক পেনশন স্কীম চালু করা হলে কর-রাজস্বের একটি অংশ যেহেতু ঐখানে স্থানান্তরিত হবে তাতে চলমান কার্যক্রমে ঘাটতি বা বাজেটে বাড়তি চাপ পড়ার আশংকা তৈরি হবে। সেটি দু'ভাবে মোকাবিলা সম্ভব। **এক.** দেশের সকল বয়স্কদের জন্য সর্বজনীন পেনশন বা অবসর ভাতা চালু হলে পৃথক বয়স্ক ভাতার অংশটি সাধারণ পেনশন কার্যক্রমে সংযুক্ত হয়ে যাবে, হয়ে যাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন তহবিলও। অতিদরিদ্রদের সামাাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাকী অংশের অর্থায়নের জন্য জাতীয় রাজস্বের পৃথক বরাদ্দ কমে যাবে বা নাও লাগতে পারে। এর সম পরিমাণ অর্থ দেশের বিত্তবানদের প্রদেয় যাকাতের অর্থ পরিকল্পিত শরীয়াহ নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র সংগ্রহ করতে পারে। দেশে যত লোক আয়কর প্রদান করেন তার চেয়ে বেশী মানুষ কমবেশী যাকাত আদায় করে থাকে। যাকাত প্রদানকারীদের কোন নিবন্ধন নেই এবং যাকাত দেয়া-নেয়ার সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সরাসরি কোন সম্পর্কও নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় ইসলামী ফাউন্ডেশনের যাকাত তহবিলে যাকাতের যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয় সে পরিমাণ অর্থের কর রেয়াত পাওয়া যায়। এখানে সরকার কিছু প্রনোদনামূলক বাড়তি দায়িত্ব নিলে যাকাত ফরজ হওয়া ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ে প্রভূতভাবে উপকৃত হতে পারে। রাষ্ট্র অতিদরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অর্থায়নের একটি বিকল্প উপায় পেতে পারে।

বর্তমানে যেসব ব্যক্তি আয়কর দিয়ে থাকেন তাদের একটি বড় অংশ ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে যাকাতও দিয়ে থাকেন। যাকাতের অর্থের পরিকল্পিত ও প্রকৃত ইসলাম সম্মত পন্থায় দেয়া নেয়া না হওয়ার কারণে একদিকে এ অর্থের সুফল সমাজ সঠিকভাবে পায়না। অপরদিকে সত্যিকার করদাতাদের উপর একটি মানসিক চাপ থাকে।

এমন প্রশ্নও শোনা যায় এত টাকা ট্যাক্স দেয়ার পরও সঞ্চয়ের উপর আবার আড়াই শতাংশ যাকাত ফাঁকি দিয়ে বা ট্যাক্স কম দিলে সরকারের শাস্তি, আর যাকাত সঠিকভাবে না দিলে আল্লার ভয় দুটিই সমানভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র এগিয়ে আসলে আইন মেনে চলা ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন নাগরিক দু'দিক থেকেই মানসিকভাবে ভারমুক্ত হতে পারেন। ধরুন এমন একটি ব্যবস্থা রাষ্ট্রের জন্য সুপারিশ করা যায়, যাতে রাষ্ট্র অতি দরিদ্রদের কর্মসূচির অর্থায়নে যাকাত তহবিল ব্যবহার করতে পারবে এবং রাজস্ব বাজেট চাপমুক্ত থাকবে। আবার যাকাত প্রদানকারীগণও নিজেদের যাকাত পরিপূর্ণভাবে আদায়ের সন্তুষ্টি পেতে পারেন।

বিষয়টির একটি সহজ সুপারিশ এরকম হতে পারে। প্রতিটি টিআইএন ধারী আয়কর বিবরণীর সাথে কর বছরে কত টাকা সরকারি যাকাত তহবিলে দিতে চান তা উল্লেখ করবে এবং পৃথক চালানে আয়করের সাথে তা সরকারি তহবিলে প্রদান করবে। সরকারের দিক থেকে একটি অঙ্গীকার থাকবে একজন টিআইএন ধারী যাকাতের যে পরিমাণ অর্থ সরকারি যাকাত তহবিলে প্রদান করবে সরকার সেই টিআইএন ধারীর নামে সমপরিমাণ অর্থ ঐ ফান্ডে জমা করবে। শর্ত থাকবে, যদি সে ব্যক্তি কর প্রদানকারী হয়ে থাকেন। এতে করে কর এবং যাকাত দুটোই যারা নিয়মিত দিয়ে থাকেন তারা একটি সুযোগ পাবেন, তা হচ্ছে যে ব্যক্তি তার উপর প্রযোজ্য আড়াই শতাংশ জাকাতের অর্ধেক যদি তিনি নিজ তহবিল থেকে দিয়ে থাকেন, সরকার তার প্রদত্ত ট্যাক্স থেকে বাকী অর্থ দিয়ে তাকে পূর্ণ যাকাত আদায়ে সহায়তা করবে। আমার ধারণা এ মিলিত অর্থের পরিমাণ প্রতি বছর সেফটি নেটের মোট বরাদ্দের চেয়ে বেশী বই কম হবে না। সরকারী তহবিলে যাকাতের অর্থ প্রদানের জন্য নতুন করে কর রেয়াতে প্রশ্ন আর আসবে না।

এ উদ্দেশ্যে সরকার 'জাতীয় যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতি' প্রণয়ন করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর সংগ্রহের সাথে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের যাকাত সরকারের বিশেষ তহবিলে স্থানান্তর করে দিতে পারে। এ অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের একটি সমন্বয় ও সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

উপসংহার

সামাজিক নিরাপত্তার টেকসই ও একটি ভবিষ্যতমুখি ধারণা হিসাবে বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির সামর্থ্যের আলোকে সর্বজনীন নাগরিক পেনশন নীতির বিষয়টিকে গুরুত্ব সহাকরে ভেবে দেখার জন্যই এ আলোচনার সূত্রপাত। সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করলে এ কর্মসূচির অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নতুন সংকট দেখা দিতে পারে। তাই বিদ্যমান আয়কর, নবসৃজিত সামাজিক নিরাপত্তা বীমা এবং প্রস্তাবিত যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবহার সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার সমন্বিত ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হতে পারে। শুধুমাত্র সরকারি চাকুরির সুবিধা হিসোবে পেনশন নয়, জাতীয়ভাবে সকল সিনিয়র সিটিজেনের জন্য আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সাংবিধানিক অঙ্গীকার থেকে বিষয়টিকে দেখতে হবে এবং নাগরিকের রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব এবং বিশেষত: কর ব্যবস্থার সাথে পেনশন ব্যবস্থার একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যবস্থাটি চালু হলে দেশের আয়কর ব্যবস্থার আওতা অতিদ্রুত সম্প্রসারিত হবে। কর্মকালীন সময়ে এবং মানুষ তার বৃদ্ধ বয়সের ভরণপোষণের দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মুক্ত থাকবে। এটি সামাজিক জীবনে অনেক বেশী স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে।

[১] GOB (2015-July) National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, GED, Planning Commission, Dhaka.

[২] ibid

[৩] M.Alimullah Miyan (United) Retirement and Pension System in Bangladesh, IUBAT, Dhaka (E-mail: miyan@iubat.edu)